পঞ্চম অধ্যায়

কবিতায় ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব

বরাকের অন্যতম কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য,[১] তাঁর 'মে উনিশ' কবিতাটিতে বরাকের ভাষা আন্দোলনের একটি সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন। মূলত এই সময়ের অধিকাংশ কবিতায় আত্মদ্রোহ, বিপন্ন-বিষাদ ও পলায়নমনস্ক ভাব ধরা পড়েছে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিলচরে রাজ্য পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালনা করে। এর ফলে ১১ জন ভাষাপ্রেমিক শহিদ হল এবং ৩০ জন আহত হল। তারা বাংলাভাষাকে কর্মের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা তাঁরা করতে পারেনি যদিও তাঁরা অন্য ভাষাকে কর্মের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। তাঁদের মাতৃভাষার প্রতি যে অগাধ প্রেম ও শ্রদ্ধা আছে তার জন্যই তাঁরা মাতৃভাষার স্বীকৃতির জন্য নিজের বা পরিবারের কোনো চিন্তা না করে বুকে বুলেট গ্রহণ করে নেয়। সেই যুদ্ধ থেকে তাঁরা পিছপা হন না। কারণ তাঁরা জবান দিয়েছিলেন যে তাঁরা মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেবেন।

'যে ফুল যে গাছে, সে কি কভু দেয়
নিজ পরিচয়, অন্য ফুলে?'

(১৯-এর কবিতা ও গান, পৃ. ১৩)

— পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষের পরিচয় বিভিন্ন ভাষাতে তারা কখনো নিজের আসল পরিচয় নিজের মাতৃভাষাকে লুকিয়ে দেয় না। তারা কেউ বাঙালি, কেউ অসমিয়া, কেউ ওড়িয়া ইত্যাদি। নানা নামে তাদের পরিচয়। আর তারা এভাবেই বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত, এভাবেই তারা ভালো আছে। এই নিয়মই তাদের রক্তে জবান হয়ে প্লাবিত হচ্ছে, মূলকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

'জবান ছেড়ে যে জান নিয়ে বাঁচা
নীল হয়ে থাকা গিলে বিষ।' (তদেব, পৃ. ১৩)

দশজন ভাই ও এক বোনের সতেজ প্রাণ নিয়েছিল যে উনিশ মে দিনটি তা আজও সবার কাছে এক পবিত্র দিন।

'এগারো ঘোড়ার পিঠে টগবগ
ছোটে দিয়ে ওরা রক্তে শিস।।

... রক্তে শিস, রক্তে শিস, রক্তে শিস।' (তদেব, পৃ. ১৪)

মোঃ মঈনুদ্দীন 'উনিশে মে' কবিতায় সেই টাটকা প্রাণ ঝরা শহিদদের স্মরণ করেছেন। মইনুদ্দীন লিখছেন এভাবে—

'উনিশে মে চেতনার দ্বারে কড়া নাড়াবার দিন
আপন মায়ের রক্ত ঝরানো সোনালী স্বপ্ন বীন
উভয় জীবনে নিত্যদিনের আলো হাওয়া ভালবাসা।' (তদেব, পৃ. ৩১)

আবার জন্মজিৎ রায় তাঁর 'পদযাত্রা' কবিতায় লেখেন

'উনিশে মে
মুনী সে মে,
বাংলা ভাষার জন্যে
ডেকেছে পাঞ্চজন্যে।

অমর উনিশে
এগারো চুনী সে
কেড়ে নিয়েছিল ক্রুদ্ধ,' (তদেব, পৃ. ৪১)

মোঃ মঈনুদ্দীন উনিশে মেকে ঘুম জাগানিয়া পাখি বলেছেন। যেখানে ভেদ বিভাদের বেড়াজাল ছেঁড়া, কুহুতান শোনা যায়। উনিশে মে স্বদেশের হিসেব কষার তিথি। যে মাতৃভাষাকে অসমের স্বীকৃতি প্রদানের কথা ছিল তা না পাওয়ার তালিকায় এবং তার বিরুদ্ধে সোচ্চার অভিমান।

আবার জন্মজিৎ বলেন তিনটি দশক পেরিয়ে আসার পরও যুদ্ধ এড়িয়ে রক্ত এড়িয়ে রাজপথ থেকে গলিপথ দিয়ে প্রতিবার আসে উনিশ। কারণ এই দিনটি 'জলদটির ধুনি সে।'

আবার তপোধীর ভট্টাচার্য[২] তাঁর এলিজি ১৯ মে ১৯৮৪ কবিতাটিতে লেখেন—

'কতটুকু দিয়েছিলে আগুনের সহজ অভ্যাস?
নিজস্ব দিগন্ত' (তদেব, পৃ. ৪৩)

কবির ভাষায় বরাকের প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন সুন্দর ছিল, তাদের জীবনে বিপুল উল্লাস ছিল, প্রত্যেকের বাঁকা সিঁথিতে রাঙা সিঁদুর ছিল, আশ্চর্য নিবিড় ছিল, প্রতিদিন প্রতিরাত প্রেমিকার চুল ছিল নির্জন ঝর্নার মতো উপমাবিহীন, স্বপ্ন ছিল গাঢ়, মেঘ ছিল সহমর্মী, বৃষ্টির আশ্বাস ছিল, জ্বলে উঠেছিল বরাকের নিভৃত দিগন্ত আগুনের সহজ অভ্যাসে।

'আজ পড়ে আছে শুধু মুঠো মুঠো ছাই
কুণ্ঠাহীন পাপের প্রহরে।' (তদেব, পৃ. ৪৩)

অন্যদিকে অমিতাভ দেবচৌধুরী[৩] 'জীবনানন্দের মৃত্যু' নামক প্রতীকী কবিতায় এই উনিশে মে-কে এক অন্যরূপে সাজিয়ে তুলছেন।

প্রকৃতার্থে জীবনানন্দের[৪] মৃত্যু মানে তা জীবনানন্দের মৃত্যুর কথা নয়। এ যে বাংলা ভাষার মৃত্যুর কথা। তাই অমিতাভ লেখেন—

'আজ এই আগুনের মাসে
সে সব পাখির মৃত, অপার পালক
বৃষ্টি হয়ে, চুপে যায় ঝরে।
নিজের হৃদয় থেকে বের হই।
চেয়ে দেখি প্রকৃতির মুখে এই
মাঝরাতে, ওকি, পশ্চিম আকাশে
কেন হঠাৎ-রৌদ্রাশ্ব, না তা রক্তের উৎসব?' (তদেব, পৃ. ৭৬)

তপোধীর দেখেছিলেন সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে ১৯শে মের কালো দিন আর অমিতাভ দেখছেন সরাসরি রক্ত জমাট বাঁধছে। আকাশটা কালোয় কালোয় মরে যাচ্ছে।

মনের খাঁচায় শুধু একটি পাখির ডানার ঝাপটা। এতদিন তো সবই সুন্দর ছিল।

'তবু তারও চেয়ে বড় সময়ের সান্ত্বনার ভাষা
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।
চারদিকে, চেয়ে দেখি, জীবন-গ্রামার।' (তদেব, পৃ. ৭৭)

কোথাও এখন মহৎ রাষ্ট্রের স্বপ্ন নেই, শুধু জাতি, ধর্ম, ভাষার নামে জট পাকানো যুদ্ধ। সমস্ত পথ যেন অন্ধ হয়ে গেছে। আর সেই অন্ধ পথে শুধু 'বেদনার ঠান্ডা নিম হাসি হয়ে আছে।'

'সব কথা ভুলে গেলে সাজানো বাগান
মরুভূমি তুলে নেয় কোনো কোনো কথা
অপমানে পড়ে থাকে আবাদের ভাষা
শেষ হয় এভাবেই আদান প্রদান।'

— এই দুই শক্তিশালী কবির কবিতায় দুই ধরনের মনোভাব ফুটে উঠলেও ১৯শে মের বেদনার্ত দিনটি কিন্তু সমানভাবে ফুটে উঠেছে।

১৯ শে মে যে কেবল বরাক উপত্যকার মানুষেরই মর্মমূলে নাড়া দিয়েছিল তা নয়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবির কলমও সোচ্চার হয়ে উঠেছে এই ১৯শে মে-র প্রতিবাদে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম শক্তিমান কবি সঞ্জয় চক্রবর্তী[৫] এই '১৯শে মে' নামেই কবিতা লিখছেন। সঞ্জয় লিখছেন : ১৯শে মে, যেদিন বাংলাভাষাকে স্বীকৃতিদানের জন্যে আন্দোলন শুরু হওয়ায় রাজ্য

পুশিল তারাপুর রেলস্টেশনে নির্বিচারে গুলি চালায় তার সাক্ষী কবির বাবা স্বয়ং। কবি বলছেন, কবি সেই পাখি যাঁর ঠোঁটে তাঁর বাবা রেখে গেছেন মাতৃভাষাকে ভালোবাসার দুরন্ত গল্প। শিশুর যখন কথা ফোটে তখন মা-কে সে যে ভাষায় ডাকতে শেখে, তার আবদারগুলো বলতে শেখে, সেটাই তার মাতৃভাষা। সেই মাতৃভাষাকে ছেড়ে দেওয়া মানে নিজের অস্তিত্বকে জলাঞ্জলি দেওয়া। কেন দেব আমরা নিজের অস্তিত্বকে জলাঞ্জলি? আমরা যত ভাষাতেই কথা বলতে শিখি না কেন নিজের মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে বা তাকে অবজ্ঞা করে শিখে কোনো লাভ নেই। সেই মাতৃভাষা বাংলাকে কর্মক্ষেত্রে সরকারি ভাষা হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন এই আন্দোলনকারীরা। কিন্তু তা হল না। বরং তার বদলে এগারোটি সতেজ প্রাণকে শহিদ হতে হল। আর এই শহিদদের মায়েদের বুক ভাঙা কান্না! এই সমস্ত দৃশ্যেরই সাক্ষী ছিলেন কবির বাবা। আর কবিকে শিখিয়ে গেছেন মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে। প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে মাতৃভাষাকে সম্মান করতে। কবি সঞ্জয় শেষ করেছেন এভাবে—

'শাবকেরা গল্পহীন'। (তদেব, পৃ. ৭৬)

অন্যদিকে ত্রিপুরার কবি প্রবুদ্ধসুন্দর কর[৬] লিখছেন 'বাংলাভাষা'। প্রবুদ্ধসুন্দর শুরু করেছেন এভাবে—

'শিয়রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলা ভাষা।' (তদেব, পৃ. ৯৫)

—কবি এখন তাঁর মাতৃভাষা বাংলাকে কী করে বলবেন যে অন্ধকার আর আলোর সংশয় চলছে। প্রাণের ভেতরে রোপিত হচ্ছে মৃত্যুর ছল। কী করেই-বা কবি তাকে বলবেন শুধু আলো নয়, অনুভূতির দেশ থেকে কখনো কখনো অন্ধকারও আসে। অর্থাৎ মানুষের মনুষ্যত্বহীনতা, অনুভূতিহীন হৃদয়ের প্রকাশ যে কোনো সময় হানা দেয়, আর তাতে নষ্ট হয় ভাষা সংস্কৃতির বীজ।

আবার আরেক অন্যতম শক্তিশালী কবি স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য[৭] লিখছেন '১৯শে মে স্মরণে'।

কবিতাটির শুরুতেই রয়েছে নির্বাসনের কথা। কবি হয়তো তা ভেবেই নিয়েছেন এবার নির্বাসনে যেতেই হবে। তাই আক্ষেপের সুরে বলছেন যে নির্বাসনে যাওয়ার আগে তিনি আরেকবার 'মা'-কে 'মা' বলে ডাকবেন। তারপর ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন। আরেকবার কুলের আচার চুরি করে খাবেন।

'উঠোনে ভুলুকে আদর করব
পুঁইমাচার কাকতাড়ুয়াকে
জিভ দেখাব,
নির্বাসনে আগে, আবার
চেঁচিয়ে বলব,
উনিশে মে আমার জন্মদিন, জন্মদিন...।' (তদেব, পৃ. ১০০)

কবির মনে হচ্ছে, মাঝে মধ্যে মনে হয় যে তাঁরও একটা নাম ছিল। কোনোদিন যেন খেলতে খেলতে মার্বেলগুলির মতো হারিয়ে ফেলেছেন। কবির আরও মনে হয় :

'.. আমার একটা দেশ
একটা ভাষা

ভালোবাসা—

অন্ধকারে ফেরার পথে

কারা যেন কেড়ে নিয়েছে।'

১৯শে মে-র প্রতিবাদে কবি সারাদিন চুল বাঁধবেন না। আজ তার বিদ্রোহ করবার দিন, অভিমান করার দিন।

"মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে পরিচিত মুখ,

শহিদের রক্তে আকাশে অনন্ত গোধুলি

আজ কথা বলব না

কেবল মনে মনে

ডেকে উঠব প্রিয় নাম

আমি জানি আমার কৃষ্ণচূড়ায়

আগুন রেখে গেছে

এগারো প্রমিথিউস

ফুল ফুটবেই।"

— কবিতাটি শেষ হয়েছে এক অস্তিবাদী মানসিকতায়। কবির বিশ্বাস যে এই এগারোটি সতেজ প্রাণের বিনিময়ে একদিন বাংলাভাষা স্বীকৃতি পাবেই পাবে।

আবার বরাকের অন্য এক কবি ভক্ত সিং[৮] তাঁর 'উনিশে মে' কবিতায় এভাবে বলেছেন যে—

'উনিশে মে'র দিন তাঁর বুকের ভেতরে থেকে ছুটে আসে 'ট্রেনের কনসার্ট'।

'হাওয়ায় বিদ্যুৎ খেলে

অহরহ ঝড়

শির উপশিরা থেকে তারবার্তা এসে যায়

"আজ উনিশে মে" (তদেব, পৃ. ১০১)

কবির মনে হয় প্রত্যেকটা শব্দের ধ্বনি বলে যাচ্ছে মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিতে, প্রাণ দিতে। কারণ—

'আমি অনেক অনেকদিন

মুখে মুখে থেকে যেতে চাই।'

ভক্ত সিঙের কবিতায় মাতৃভাষার প্রতি নিজের আর্তিই ফুটে উঠেছে, ১৯শে মে-র সেই নিষ্ঠুরতা ছাড়াও মাতৃভাষা বাংলা যে অনেক অনেক দিন মানুষের মুখের ভাষা হয়ে থাকতে চায়, এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে।

কখনো-বা সোচ্চার হয়ে উঠেছে, কখনো শহিদ তর্পণ করেন, কখনো-বা আবার প্রতীকী ভাষায় আন্দোলনের এই ভয়াবহতাকে তুলে ধরেন।

আমরা দেখলাম বরাক কিংবা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিরা এই অনন্ত অভিঘাতকে কীভাবে তাঁদের কবিতায় তুলে ধরেছেন।

বাংলা ভাষার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে প্রাণ দিয়েছিলেন নুরুল, বরকতরা। পরবর্তী কালে রাষ্ট্রসংঘ এই দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছে। ১৯৫২-র পর ১৯৬১ সালের ১৯ মে এই বাংলা ভাষার জন্যই শহিদ হয়েছিল ১১টি প্রাণ।

১৯ মে নিয়ে পরবর্তী সময়ে অনেকেই প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন। অনেকের আবার কাব্য-উপন্যাস-গল্পের বিষয়ে হয়েছে। প্রকাশ করেছেন প্রতিবাদের কণ্ঠ।

বস্তুত বাংলাদেশের ২১ ফেব্রুয়ারির পর অসমেরই একটি অঙ্গ বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে যে আন্দোলন হয়েছিল তা বাঙালির মর্মমূলকে নাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং নামী অনামী সব কবি এই দিনটির প্রতিবাদে কলম ধরেছেন।

অসমের দুটি উপত্যকায় সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাষা আন্দোলন হয়েছে। বরাক উপত্যকায় ১৯৬১ সালের ১৯ মে ভাষা রক্ষার দাবিতে মৃত্যু হয়েছিল ১১ জনের। সেটি ছিল বাংলাভাষা রক্ষার লড়াই।

আবার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমিয়া ভাষীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার আরেকটি আন্দোলন শুরু হয় গত শতাব্দীর আটের দশকে গোড়ায়।

এই দুটি আন্দোলন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। অসমের বাঙালিরা বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র পারের বাঙালিরা শুধু দেশভাগের আনন্দ বা বেদনা নিয়েই বেঁচে নেই। ভাষা আন্দোলন, জাতিগত দাঙ্গার স্মৃতিও আমৃত্যু বহন করেছেন এ অঞ্চলের বাঙালিরা। স্বাভাবিকভাবেউ কবিদের কলমে উঠে এসেছে জাতিদাঙ্গা বা দেশভাগের অম্লান চিত্র ।

অস্বস্তিকর দশকওয়াড়ি হিসেবে আটের দশকের কবি কিশোর ভট্টাচার্য[৯] একটি কবিতা শুরুই করেছেন এভাবে —

"হুররে আজ আসাম অ্যাকর্ড"।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন পঙ্‌ক্তি লেখা যায় না।

সময়টা ষাটের দশক। কবিদের ঘিরে ছিল এক অস্থিরতা। মেধা বা মনন জীবনসত্য আঞ্চলিকতা ডিঙিয়ে তখন উড়াল পাখি বৃহত্তর বাংলা কাব্য ও সাহিত্য আকাশে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব না দিয়ে মূলস্রোতে বয়ে যাওয়ার জন্য হৃদয় ও কলম তীব্র ভাষায় কাজ করে চলেছে। নির্দ্বিধায় বলা যায় অতন্দ্রকে[১০] কেন্দ্র করেই তখন এক কাব্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এহেন সময়ে বাংলাভাষাকে অধিকার রাজ্যভাষা করতে বরাকে শুরু হল ভাষা আন্দোলন। আর বাঙালি কবিদের কলম তখন উন্মুখ হয়ে উঠল ভাষা আন্দোলনের পরিপেক্ষিতে।

"১৯শে মে" নিয়ে বস্তুত বরাকের কবিদের কলমই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দু-একজন শক্তিমান কবির কাব্যেও এই আন্দোলনের রেশ উঠে এসেছে।

১৯শে মে বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যতদিন বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতি পৃথিবীর বুকে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলবে— ততদিন পর্যন্ত ১৯শে মে অমলিন গৌরবে এক আলোকবিন্দু হিসেবেই দিক নির্দেশ করে যাবে।

১৯শে মে, ১৯৬১ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে, শিলচর রেল স্টেশনে এগারোজন তরুণ-তরুণী বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষর ইতিহাসে এরকম ঘটনা এর আগে আর কখনো ঘটেনি। বিশ্বের ইতিহাসেও এরকম ঘটনা এর আগে আর কখনো ঘটেনি। বিশ্বের ইতিহাসেও তা বিরল।

ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উজ্জীবিত একদল মানুষ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে নিলেন আমাদের প্রতিবেশী ভূখণ্ডে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১, মাত্র উনিশ বছরের ব্যবধানে। বাঙালির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে এ-ঘটনা শুধু ঐতিহাসিক নয়, যুগান্তকারী। পৃথিবীর সভ্য মানুষের ইতিহাসেও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের এধরনের উজ্জ্বল সাফল্য নজিরবিহীন।

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় ঘটেছে— যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা। পাকিস্তানের কুক্ষিগত পূর্ববাংলার সংগ্রামী ছাত্র ও জনতা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রবর্তনের দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। খুবই গৌরবের বিষয়, রাষ্ট্রসংঘ সেই ২১ ফেব্রুয়ারিকে আজ "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছরই তা পালিত হয় রাষ্ট্রসংঘের সদস্য প্রতিটি দেশে।

বাহান্ন থেকে মাত্র ন'বছর পর, ১৯৬১ সালে, তদানীন্তন কাছাড়, বর্তমান বরাক উপত্যকায় ভাষার দাবি জানাতে গিয়ে, নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এগারটি তাজা প্রাণকে আত্মবলি দিতে হয়েছিল শিলচরে। অনেকেই পঙ্গু হয়েছেন। কিছু কিছু পরিবারে দুর্দৈব নেমে এসেছে, অপরিমেয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু ফলশ্রুতি? ইতিহাসের প্রয়োজনেই তার পর্যালোচনা জরুরি।

যে সমস্ত দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল— তা আজও অপূর্ণ। এই অপ্রিয় সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আন্দোলনের ব্যর্থতার সবচেয়ে দুঃখজনক দিকটি হল আজ পঞ্চাশ বছর পরও শহিদদের সরকারি স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত মেলেনি। গুলিবর্ষণের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল তার রিপোর্ট আজও হিমঘরে। বিধানসভায় এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে রিপোর্টটিই নাকি এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চক্ষুলজ্জাহীন বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কেউ কারও কাছে জবাবদিহি করার প্রয়োজন বোধ করে না। একটি রাষ্ট্র নাগরিকদের হত্যা করেও যখন বিচারের ঊর্ধ্বে থেকে যায় তখন কি তাকে সভ্য রাষ্ট্র বলা সংগত?

অসমে ভাষা-বিরোধ দীর্ঘদিনের। বলা যায় তা ইংরাজ-সৃষ্ট। ব্রিটিশরা অসমকে ইংরেজ অধিকারে নিয়ে আসার পর যখন দেখল এখান থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব দ্বারা প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ সম্ভব নয়, তখন তারা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাকে অসমের সঙ্গে জুড়ে দেয়। ফলে নবগঠিত রাজ্যের প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প— সব ক্ষেত্রেই বাঙালিদের ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ ঘটে। এ ছাড়া নব

প্রতিষ্ঠিত চা-শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, জাহাজ বা রেল পরিবহণ সম্প্রসারণের প্রয়োজনেও বাঙালিদের ব্যাপক প্রব্রজন ঘটে এই রাজ্যে। তথাকথিত ভূমিপুত্রদের দিয়ে সমস্ত চাহিদা মেটানো সম্ভব চাহিদা ছিল না। এমনকি কৃষিকাজের জন্যও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নানভাবে প্রলোভিত করে নিয়ে আসা হয়।

অসমিয়া ভাষার প্রসার, শিক্ষা, সংস্কৃতি— সব ক্ষেত্রেই বাঙালিদের অবদান রয়েছে। কিন্তু সদ্য উদ্ভূত অসমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাঙালিদের প্রতিপক্ষ এমনকি শত্রু ভাবতে শুরু করে। এর পেছনে খ্রিস্টান মিশনারিদেরও ইন্ধন ছিল। ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত যোরহাট সার্বজনিক সভা সরকারি চাকরিতে ভূমিপুত্রদের অগ্রাধিকার এবং সংখ্যাধিক্য দাবি করে, ১৯১৭ সালে অসম সাহিত্য সভা এবং ১৯১৯ সালে অসম ছাত্র সম্মেলন অসমের জন্য ভাষাগত আঞ্চলিক পরিচয়ের রক্ষাকবচ দাবি এবং সরকারের কাজকর্মে বাঙালিদের নিযুক্তির ব্যাপারে আপত্তি জানায়। যদিও শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া তখন অসম প্রদেশেরই অন্তর্গত এবং বাঙালিরা সংখ্যার দিক দিয়ে অসমিয়াদের চেয়ে কম নয়। এক শ্রেণির অসমিয়া বুদ্ধিজীবী তখন থেকেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জেহাদ শুরু করেন। বিভিন্ন ফোরাম থেকে যে সমস্ত দাবি তোলা হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে— ১) সব ধরনের নিযুক্তিতে স্থানীয়দের (অসমিয়া ভূমিপুত্র) অগ্রাধিকার, (২) অসমের জমি বহিরাগতদের থেকে দখলমুক্ত করা, ৩) বাংলাভাষী জেলাগুলিকে বঙ্গদেশের সঙ্গে যুক্ত করা।

রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, বাধ্যবাধকতা বা অবিমৃশ্যকারিতা— যাই বলা হোক না কেন, তদানীন্তন জাতীয় নেতৃত্ব উগ্র অসমিয়া জাত্যাভিমানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে, গণভোটের মাধ্যমে শ্রীহট্ট জেলাকে পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হয়। বিরাট সংখ্যক বাঙালি ও অন্যান্য ভাষাভাষী অধ্যুষিতঅসমকে একমাত্র অসমিয়াভাষী রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মূল প্রতিবন্ধক অপসারিত হল বলেই তদানীন্তন অসমিয়া নেতৃবৃন্দ ধরে নিলেন। শ্রীহট্ট বিদায় সন্দেহাতীতভাবেই উগ্র অসমিয়া জাত্যাভিমানের এক বিরাট সাফল্য।

বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংহতি ও সৌহার্দ্যের কথা ভেবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ত্রিশের দশকেই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic Zone) হিসেবে প্রদেশে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নিল। বলা বাহুল্য এর মধ্যেই নিহিত ছিল অনৈক্যের বীজ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরই অসমের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) গোপীনাথ বরদলৈ[১১] গোলাঘাটে এক ছাত্র সম্মেলনে ঘোষণা করলেন— It is not intention of the Government to make Assam a bilingual state. For homogeneity of the province, they (i.e.,Non Assamese) should adopt the Assamese language... Assam is for Assamese. (উনিশের কবিতা, পৃ. ১৩)

এই দর্শনই ফুটে উঠল স্বাধীনতা-উত্তর অসম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে, রাজ্যপালের ভাষণে... The native of Assam are now masters of their own house. They have a Government which is both responsible and responsive to them. They can take what steps are necessary for encouragement and propagation at Assamese language and culture and the languages and custom of tribal people, who are their fellow citizens

and who also must have a share in the formation of such policies. The Bengalee has no longer the power, even if he had the will, to impose any thing on the people of these hills and valleys which constitute Assam. The basis of such feling against him as exist is fear but there is no cause of fear I would therefore appeal to you to exert all the influence you posses to give the stranger in our midst a fair deal, provided of course, he in his turn deals loyally with us. কল্পনা করা যায়, স্বাধীন দেশে একটি প্রদেশের রাজ্যপাল, ওই প্রদেশে বসবাসকারী কোনও ভাষাগোষ্ঠীয় লোকদের সম্পর্কে এ-ধরনের মন্তব্য করতে পারেন, গণতন্ত্রের পবিত্রতম সৌধ আইনসভায় দাঁড়িয়ে!' (তদেব, পৃ. ১৩)

১৯৪৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, যেদিন রাজ্যপাল এই ভাষণ পাঠ করছেন, সেদিন কিন্তু গোয়ালপাড়া জেলার অসমিয়াকরণ সম্পন্ন হয়নি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যান্য জেলায়ও বংশানুক্রমিকভাবে বসবাসকারী বাঙালিরা নিজেদের ভাষিক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিলেন, অবিভক্ত কাছাড়ের বাঙালি জনসংখ্যা মিলিয়ে রাজ্যে বাঙালির অনুপাত তখন আধাআধি না-হলেও চল্লিশ শতাংশের তো বেশিই ছিল। অসম সরকার তথা অসমিয়া উগ্র জাত্যাভিমানীরা কিন্তু কোনোরকম বিচার-বিবেচনা ছাড়াই ভাষিক একাধিপত্য স্থাপনে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের জন্য গঠিত কমিশনের সুপারিশ ছিল কোনও প্রদেশে একক ভাষাগোষ্ঠীর অনুপাত সত্তর শতাংশ না-হলে সেটিকে এক ভাষাভাষী প্রদেশ বা ইউনিলিঙ্গুয়াল স্টেট করা যাবে না।

১৯৫১ সালের জনগণনা রিপোর্টকে নানাভাবে প্রভাবিত করেও অসমিয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা পঞ্চান্ন শতাংশের বেশি দেখানো যায়নি। ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালে অসমের অসমিয়াভাষীদের বৃদ্ধির হার এত ব্যাপক এবং অস্বাভাবিক ছিল যে সেনসাস কমিশনার ভাগাইওয়ালা মন্তব্য করেছিলেন, এটি একটি (Biological Miracle)। ওই সেনসাস অনুযায়ী ১৯৩১ থেকে ১৯৫১ বিশ বছরে অসমিয়া জনসংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে হয় ৪৮ লক্ষ আর বাঙালি জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ লক্ষ থেকে কমে ১৭ লক্ষে। গণভোটে সিলেট পাকিস্তান চলে যাওয়া সত্ত্বেও বাঙালিদের এই সংখ্যা কোনও হিসেবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও অসমিয়াকে একক রাজ্য ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার উপাত্ত যখন সংগৃহীত হল না— একদিকে আরম্ভ হল বাংলাভাষীদের উপর জোর-জুলুম,অত্যাচার, দাঙ্গা, অন্যদিকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ২৮ অক্টোবর, ১৯৬০ বিধানসভায় রাজ্যসভা আইন পাশ করানো হল। অথচ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুরাম মেধি[১২] স্বয়ং State Reorganisation Commission-এর কাছে স্বীকার করেছিলেন অসম একটি বহুভাষিক রাজ্য। Assam disturbance নিয়ে যখন সংসদে আলোচনা হয় তখন ডাঃ হৃদয়ানাথ কুঞ্জরু,[১৩] যিনি এসআরসি-র অন্যতম সদস্যও ছিলেন, স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে Assam is a multi-lingual state. বিধানসভায় কাছাড়ের প্রতিনিধিরা একমাত্র অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা হিসেবে ঘোষণায় আপত্তি করলেন। অনেকে পদত্যাগও করলেন। সারা রাজ্য জুড়েই বাংলাভাষীদ্দের এই ভাষা আইনের প্রয়োগ প্রতিরোধ করার জন্য কাছাড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেওয়া হল। দীর্ঘদিন ধরে সভা-সমাবেশ, বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের পর ১৯ মে, ১৯৬১ তারিখে এই আন্দোলন তার চরম শীর্ষে পৌঁছল— যেদিন শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে এগারোজন তরুণ-তরুণী পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি দিলেন।

কিন্তু তাদের আত্মবলিদান সার্থক হল না। সারা অসমের বাঙালি তথা ভাষিক সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষার

মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম ছিল, রাজনৈতিক কাপালিকদের চক্রান্তে তা আপসের চোরাবালিতে বিপথগামী হল। কাছাড়ের জেলা স্তরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির তথাকথিত শাস্ত্রী-ফর্মুলা আজও শুধু কাগুজে সিদ্ধান্তমাত্র। কার্যে রূপান্তরিত হয়নি। বাংলা ভাষার মর্যদা রক্ষার দাবিতে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় যেখানে বাঙালি জাতিসত্তার লৌহদৃঢ় ঐক্যের বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, এখানে দেখা গেল বিপরীত স্রোত। স্বার্থান্ধ নেতৃত্বের অঙ্গুলি হেলনে কাছাড়ের বাংলাভাষীদের একাংশ বাংলা ভাষায়ই স্লোগান দিয়েছিল— 'আমাদের ভাষা অসমিয়া ভাষা', 'বাংলা ভাষা চাই না, চাই না।' একষট্টির ভাষা আন্দোলনে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট উভয় দলই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। বিশেষ প্রতাপশালী কংগ্রেসি মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর মদতে গড়ে উঠেছিল আন্দোলন বিরোধী শান্তি পরিষদ। কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যায়িত করে কর্মীদের এ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদক ফণী বরা বিবৃতি দিলেন— 'কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদের এই আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। অসমকে বহুভাষী রাজ্য করার যে কার্যসূচি এই আন্দোলনে গৃহীত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি তা সমর্থন করে না।' ইতিহাসের জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা যে শুধু একষট্টি সালেই আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল তাই নয়,আজও অসমিয়া সম্প্রসারণবাদের পদলেহীরা প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে— বরাকের ভাষা বাংলা নয়, বরাকী। বরাকের অফিস আদালতে অসমিয়া ভাষায় মুদ্রিত ফর্ম-কাগজপত্র এলেও দোষের কিছু খুঁজে পান না। সেই সব নেতার কৃপাধন্য হওয়ার জন্য তথাকথিত ভাষাদরদী, সংগ্রামী নেতাদের হুটোপুটি — উনিশের উত্তরাধিকার-গর্বিত প্রজন্মকে কোন পথনির্দেশ করে—তার ইঙ্গিত এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।

বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন নিয়ে পূর্ব বাংলায় যে-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। কবিতা, গান, নাটক, গল্প-উপন্যাস যেমন লেখা হয়েছে তেমনি আন্দোলনের আনুপূর্বিক বিবরণ ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ পূর্ব বাংলার সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। সব অগ্রণী সাহিত্যকর্মীই এত অংশ নিয়েছেন।

উনিশের ঘটনা এপারের বাঙালি মননে তাৎক্ষণিক একটা নাড়া দিলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠেনি। মণীশ ঘটক,[১৪] বনফুল,[১৫] দক্ষিণারঞ্জন বসু[১৬] প্রমুখ কবিতা লিখেছেন শহিদদের স্মরণে, মনোজ বসুর[১৭] গদ্যেও তার স্বীকৃতি রয়েছে, আন্দোলনের প্রতিবেদনমূলক বই সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরীর 'মুখের ভাষা বুকের রুধির'ই একমাত্র বহুল প্রচারিত সাহিত্যকর্ম।

শিলচরের শিল্পী-গায়করা শহিদদের নিয়ে গান বেঁধেছেন, মিছিলে সমাবেশে তা গাওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কবি-লেখকদের তাৎক্ষণিকভাবে তেমন এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। ঘটনার বহু বছর পর ১৯শে মে নিয়ে যখন নতুন প্রজন্মের মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল, প্রয়াস চলল, তখন কলম ধরতে বাধ্য হলেন কবিরা। কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য ও অনুরূপা বিশ্বাস দুটি সংকলন প্রকাশ করলেন উনিশের স্মরণে। উনিশে মে-কে কেন্দ্র করে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম অশোক বার্মার উপন্যাস 'ভোরের সানাই' যা 'বরাক'-এর একটি শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, এখনও গ্রন্থ হিসেবে মুদ্রিত হয়নি।

গুটিকয়েক গল্প লিখেছেন নতুন প্রজন্মের গল্পকাররা।

কবিতা অনেকেই লিখেছেন এবং লিখছেনও। উনিশের ইতিহাস নিয়ে বই লিখেছেন বিপ্রবাজ দাস,[১৮] সুবীর কর,[১৯] সনৎকুমার কৈরী,[২০] পরিতোষ পাল চৌধুরী,[২১] কানু আইচ,[২২] ইমাদউদ্দিন বুলবুল[২৩] প্রমুখ।

গত ক'বছর ধরে কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন এবং সংকলনও প্রকাশ হচ্ছে উনিশকে কেন্দ্র করে।

উনিশকে নিয়ে বৃহৎ এবং ব্যাপক অর্থে কাজ করেছেন দিলীপকান্তি লস্কর[২৪]। অপরিমেয় পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে 'লালন মঞ্চ'[২৫]-এর দুটি বৃহৎ সংকলনও প্রকাশ এক উল্লেখযোগ্য অবদান। পরবর্তী সময়ে লালন মঞ্চ-এ প্রকাশিত রচনাগুলোকে পৃথক পৃথক পুস্তক হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

১৯৬১-র ভাষা আন্দেলনে ১১ জন যে শহিদ হয়েছিল তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক[২৬] 'বাংলা ভাষার শহিদ' নামে যে কবিতাটি লেখেন তার তাৎপর্য এরকম— বাংলার রবি ঠাকুর দেশে ও বিদেশে যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেছেন তার বাংলা কাব্য কবিতা বা অন্যান্য রচনার জন্যে, সেই বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে ১১ জন যে তাঁদের প্রাণ বলি দেবেন, একথা কবি স্বপ্নেও ভাবেননি। কবি বলেছেন অসমের অন্যতম শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ক্ষুধার্ত। তিনি কি ভাষাশহিদের মুণ্ডমালা নিয়ে প্রীত হবেন? কবির বিশ্বাস বাংলা ভাষা একদিন অমিত শক্তি লাভ করবে এই ১১ জনের রক্তের মূল্যে। কারণ সত্যাগ্রহী অমৃতের পুত্র কোনদিন মরে না। এই মা কামাখ্যাই সোনার টোপর পরিয়ে দেবেন তাঁদের শিরে। আর মাকে ঘিরে এবং মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে ঘিরে এই শহিদেরা চিরদিন গৌরব নিয়ে সকলের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

আবার শহিদ কমলা ভট্টাচার্যকে[২৭] নিয়ে লেখা মণীশ ঘটকের কবিতা 'শিলচরের কমলা ভট্টাচার্যের মায়ের কান্না'য় মায়ের যে আর্তি ফুটে উঠেছে সে আর্তি শুধু কমলা ভট্টাচার্যের মায়ের নয়। এযেন সমস্ত বাঙালি মায়ের আর্তি। কবিতাটা শুরু হয়েছে এভাবে 'সে যে বলে গেল জান দেব তবু জবান কখনও দেবো না'— সে সর্বনামটি আমলে কমলা ভট্টাচার্য স্বয়ং যাকে তার মা কমলি বলে ডাকেন। যাওয়ার আগে কমলা বলে গেছিলেন ভাত বেড়ে রাখতে, ফিরে এসে তিনি খাবেন, যদি নাও আসেন তবু যেন মা ভাবনা না করেন। দিদিগত প্রাণ মঙ্গলীকে যেতে দিতে চাননি তার মা কারণ সে ছোট। কিন্তু ছোট হলে কী হবে সে যে নাছোড়বান্দা। সংসার ছিল বড় অভাব অনটনের, ছোট হোক তবু দৈন্য ভরা জীবন ছিল তাদের। মেজমেয়ে বেণুবালা অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে। স্বামী সুখ কী সে তা জানে না। সেও এখন এই অভাব অনটনের সংসারের সঙ্গী। বিধবা হয়ে এখনও তার চোখের জল শুকোয়নি। যেদিন কমলা ভট্টাচার্যকে খুন করা হল স্টেশনে সেই দুঃসংবাদে সে পাগল হয়ে যায়। আর কতই-বা সইবে। মায়ের জবানে কবি বলেছেন যে তাঁরা তো জওহরলালের[২৮] কোনো অনিষ্ট করেননি। তবে কেন তিনি গুয়াহাটিতে বসে সব কাণ্ড করালেন, কেন ঘাতক পাঠিয়ে শিলচরে 'মরণ নিশান' ওড়ালেন?

দুচোখের মণি কমলি তার মাকে বলেছিল যে এবার ম্যাট্রিক দিয়ে সে টাইপ শিখবে এবং রোজগার করে মায়ের দুঃখ এবং সংসারে সুদিন আনবে। যতটুকু পারে সকলের চোখের জল মোছাবে। কিন্তু তা হল না, ভাষা আন্দোলনে যোগ দিতে গেলেন কমলা। জেদি মঙ্গলিও সঙ্গে সঙ্গে গেল। মায়ের বারণ কেউই শুনল না। শেষে একজন ফিরে এল না আর একজনও প্রায় যায় যায় অবস্থা। তাদেরই মা চোখের জল মুছে বলেন যে তাঁর কি হায় হায় করা সাজে? যে ভাষায় প্রথম মাকে ডেকেছেন সেই ভাষা তাদের দেবতা। সে ভাষায় কথা বলবার অধিকার অবশ্যই আছে তাদের এবং সে অধিকার তারা ছিনিয়ে নেবেনই। নেহরু, ফখরুদ্দিন,[২৯] চলিহার[৩০] দল যতই বলুক না কেন 'বুলেট না বাঙলা'। তবু তারা ভয় পাবেন না। বুলেট বুকে নিয়েই বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাই সেই দুঃখিনী মায়ের জবানে কবি বলেন—

"জান দেবো তবু জবান দেবো না করুক না যত হামলা।"

আবার অন্যদিকে দেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরীও[৩১] সেই ভাষা শহিদদেরই স্মরণ করে কবিতা লিখেছেন 'ভাষা শহিদ স্মরণে'— এই শিরোনামে। আলোচ্য কবিতায় কবি বলছেন সে ভাষা শহিদদের স্মরণ করে যে তাঁরা এই পৃথিবীতে তুচ্ছ সুখের তরে আসেননি। তাঁরা আলোর দূত, এসেছিলেন আধারের কুহেলিকা উন্মোচন করতে। যখনই যুগে যুগে সত্য লাঞ্ছিত হবে নিত্য অত্যাচারে, তখনই এই আলোর দূতরা আসবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এখানে শ্রীমদভগবত গীতার বাণী যা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিশ্বরূপ দর্শনে যা অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন সেই বাণী মনে পড়ে যায়। যার কথা ছিল এরকম—

'যদা যদা হি ধর্মস্য
গ্লানিরর্ভবতি ভারতঃ
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য
তদাৎমানম্ ঃ সৃজামিহ্ম্
পরিত্রানায়ঃ সাধুনাং
বিনাশায়ঃ
চদুষ্কৃতম্
ধর্মসংস্থাপনাত্থায়ঃ
সম্ভবামী যুগে যুগে।'

কৃষ্ণের মতো এই আলোর দূতেরাও বার বার আসবেন। যখনই আইনের মুখোশ পরা কুৎসিত জিঘাংসা মৃত্যুর মত দরজার কড়া নাড়বে আর সর্বনাশরূপী হয়ে কখনো মনুষ্যত্ব কেড়ে নিতে চাইবে কখনো মুখ থেকে মাতৃভাষা। এই অন্যায়েরই তো ভাষা শহিদেরা নির্ভীক প্রতিবাদ জানালেন। সাহাস্যে বুকে তুলে নিলেন বুলেটের মৃত্যু আর্শীবাদ। এখানে আবার মনে পড়ে যায় লতা মঙ্গেশকরের সেই বিখ্যাত গান—

'এ্যায় মেরে বতনকে লোগো
যারা আখ ভরলো পানী
যো শহিদ হুয়ে হ্যা উনকী
যারা ইয়াদ করো কুরবানী।'

অর্থাৎ

এই যে আমার দেশের বন্ধুরা একটুখানি চোখের জল
ফেলো সেই শহিদের জন্য যারা
নিজের জীবন দিয়ে গেলো তোমার মাতৃভূমির
জন্য আর তোমাদের সুরক্ষিত
রেখে গেল।

কবি বলেছেন এই শহিদেরা মরণ জয়ী। তাই এদের পায়ে মৃত্যুও প্রণাম করে। নিজের জীবনটাকে হেলায় ঢেলে দিলেন এরা শুধু ভাষার মহান মুক্তি পদকে উন্মোচিত করে রাখতে।

বস্তুত এদের জীবন অমর। এই শহিদরা অগ্রজ নন, অবুঝও নন, এঁরা 'অব্যয়'। এঁরা কারো ভাইও নয় কারো বোনও নয়। এরা আসলে আলোর দূত হয়ে এসেছিলেন মাতৃভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি প্রদান করে যেতে।

শেষে কবি বলেছেন—

'তোমরা আলোর দূত, তোমাদের জয়

হউক জয়।'

শ্মশান,— শ্মশান।...

'ভগ্নস্তূপের মাঝে এই পরিত্যক্ত গাঁয়ের চাতালে

চাপরি, লাহরিঘাট, গোমেশ্বর, চাউলখোয়া, নেলি

চামগুড়ি, গহপুর, মাজুলি, শিলাপথার,

নওজান, নিয়ামাটি, হাজো—

সর্বত্র চিতা জ্বলছে ঃ 'এই জুই জ্বলিছে, জ্বলিব।'

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৮৬)

এভাবেই সন্ত্রাস-দাঙ্গায় ছবি কবিতায় এঁকেছেন তিনি।

আলোচ্য ঊর্ধ্বেন্দু দাসের এই কবিতাটি সারাংশ পূর্বের পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে।

বরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী 'উনিশে মে ১৯৬১ শিলচরে' কবিতায় তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন

'দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন' (তদেব, পৃ. ৬৪)

বাংলা ভাষার জন্য ১৯শে মে এই দিনটিতে শিলচর শহরে ১১জন শহিদ হয়েছিল।

অসম বিধানসভায় ১৯৬০ সালে ১০ অক্টোবর রাজ্যভাষা বিল পাশ হয়। অবিভক্ত অসমের সে সময়ের রাজধানী শিলং শহরে বিমলাপ্রসাদ চলিহার নেতৃত্বে অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে বরাক উপত্যকায় তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল। উদ্দেশ্য বাংলাভাষাকে অসমের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান। এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিল 'কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ'। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে নিরীহ এই সত্যাগ্রহীদের রাজ্য পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে ১১ জনকে আর আহত হন ৩০ জন। শিলচর রেল স্টেশনে পুলিশের গুলিতে যাঁরা সেদিন শহিদ হয়েছিলেন তাঁরা হলেন— কমলা ভট্টাচার্য, শচীন্দ্র পাল,[৩২] চণ্ডীচরণ সূত্রধর,[৩৩] কুমুদরঞ্জন দাস,[৩৪] কানাইলাল নিয়োগী,[৩৫] সুকোমল পুরকায়স্থ,[৩৬] সুনীল সরকার,[৩৭] হিতেশ বিশ্বাস,[৩৮] তরণী দেবনাথ,[৩৯] গীরেন্দ্র সূত্রধর[৪০] ও সত্যেন্দ্র

দেব[৪১]। এই দশজন ভাই ও একটি বোনের করুণ মৃত্যু কবির মর্মমূলে নাড়া দিয়েছিল। যাঁরা বাংলাভাষার জন্য কলজে ছিঁড়ে বরাকে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। তাই কবি প্রশ্ন করেছেন যে এই অমর শহিদেরা কোন ভাষায় কথা বলেছেন? তাদের মাতৃভাষা বাংলা। কেন বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল না অসমে? যার ফলে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র— এই দুই উপত্যকায় রয়ে গেলো এক চিরকালের ফারাক।

তারপরই কবির কলম প্রতিবাদে আরও সোচার হয়ে উঠলো। 'শুনলি না?' তবে এবার এই কুচক্রী যারা বাংলাকে স্বীকৃতি দিল না, এদের ছায়ায় তিরিশ লাখ বাঙালির কণ্ঠভেদী আওয়াজ শোনো সকলে। এরা সকলে একই কথা বলছে—

'বাঙলা আমার মাতৃভাষা, ঈশান বাঙলা মা।'

(তদেব, পৃ. ৬৪)

'মা' 'ঈশান বাংলা' অর্থাৎ বরাক কারণ এখানেই এই তিরিশ লাখ লোকের মাতৃভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে।

কবিতাটি খুব ছোট্ট। কিন্তু এর তাৎপর্য বিশাল। কবি এই ১৯শে মে-র প্রতিবাদকে আরও সোচ্চার করে তুলেছেন এই কবিতার মাধ্যমে।

ওদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ঊর্ধ্বেন্দু দাসের একটি কবিতার নামই 'সাকিন আসাম ১৯৮৩'। যা পড়লেই আটের দশকের ভয়াবহ ছবি ভেসে আসে। ঊর্ধ্বেন্দু লিখছেন—

ওদিকে ভরলি আর এধারে কলঙসুঁতি, কপিলী, দিখৌ

লুইতের পার ধরে জলের উজানে যাও, জলের ভাটায় যাও,

শ্মশান-শ্মশান। ...

ভগ্নস্তূপের মাঝে এই পরিত্যক্ত গাঁয়ের চাতালে

চাপরি, লাহরিঘাট, গোড়েশ্বর, চাউলখোয়া, নেলি

চামগুড়ি, গহপুর মাজুলি, শিলাপাথার, নওজান, নিয়ামাটি, হাজো

সর্বত্র চিতা জ্বলছে ঃ এই জুই জ্বলিছে, জ্বলিব।'

— ঊর্ধ্বেন্দুর এই কবিতাটির কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এভাবেই সন্ত্রাস দাঙ্গার ছবি কবিতায় এঁকেছেন বরাক-ব্রহ্মপুত্র দুই পারের দুই শক্তিমান কবি।

বস্তুত অসমের বাংলা কবিতায় দেশভাগ ও উদ্বাস্তু চেতনা মতোই ভাষা আন্দোলন, দাঙ্গা এক বিশাল প্রভাব ফেলেছে।

তাই আরেক শক্তিশালী কবি রামেন্দ্রসুন্দর দেশমুখ্য[৪২] লিখছেন এই ১৯ মে শহিদদের নিয়ে 'শহিদের রক্ত ভুলব না'।

বর্ষার সময় ফোটা কৃষ্ণচূড়া রাঙানো শহরে শক্তিকামী সন্তানদের ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরে। তাদের মায়েরা এক চোখে কাঁদছেন আর অন্য চোখে যে কুচক্রীরা আজকে তাদের সন্তানদের রক্ত ঝরিয়েছে

তাদের উদ্দেশেন্ড ঝলসে ওঠে আগুন। জ্বলন্ত চিতা থেকে ক্রোধের মশাল জ্বলে ওঠে সেই সন্তানহারা মায়েদের বুকে।

কবি ধিক্কার দিচ্ছেন বিমল চলিহা সহ নেহরুর দলকে। তিনি জীবনের এই রক্তে রাঙা প্রভাতের আলোয় শপথ নিয়ে বলছেন প্রাণে বসন্তে এখন আর প্রেম নয়, এক দৃপ্ত মনোরথ জেগে উঠেছে—

'যাত্রা করে চিতাভস্ম নদীপথে সাগর সঙ্গমে

কমলা বোনকে ঘিরে দশভাই শহিদের মালা

হে বায়ু বরুণ অগ্নিতৃপ্ত করো মরণের তৃষা

হে নক্ষত্র শতভিষা, মহাশূন্যে মূর্ত করো জ্বালা।'

(উনিশের কবিতা, পৃ. ১৯)

তিনি এই ঘাতকদের উদ্দেশ্যে বলছেন যে আজ তাদের এই কুমন্ত্রণায় যে সন্তানদের রক্ত ঝরেছে তাতে পৃথিবীও কাঁপছে ক্রোধে। প্রায়শ্চিত্ত করুক এই কুচক্রীরা আর তাদের প্রায়শ্চিত্তে যেন এই রাত শেষ হয়।

'হে চক্রী, লুকাও মুখ, আর বিষিয়ো না এই বায়ু

শহিদের রক্তে আজ আমাদের জাগ্রত ধমনী'

আবার অতুলরঞ্জন দেব 'উনিশের গান' কবিতায় শহিদের স্মৃতিতে সে একই প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। অতুলরঞ্জন লিখছেন ঃ স্মরণের দীপ জ্বালেন প্রতিদিন তিনি, আর প্রত্যেক বছর চেতনায় 'উনিশের-গান' নাড়া দেয়।

'মে মাসের কৃষ্ণচূড়া

আরো বেশি লাল মনে হয়...

সজীব সতেজ।' (তদেব, পৃ. ২৪)

রামেন্দ্রসুন্দরের ধমনিতে শহিদের রক্ত জাগ্রত আর অতুলরঞ্জনের বুকে রক্তে মন্ত্রের হিল্লোল।

'উনিশের গান

স্মৃতির তর্পণ

ঘরে ঘরে।'

অন্যদিকে ছবি গুপ্তা লিখছেন 'উনিশে মে' নামে কবিতা। তাঁর সুর আবার অন্য ধরণের।

উনিশে মে তাঁর কাছে এত পবিত্র। এত মর্মান্তিক, এতটাই ভালোবাসার যে এই দিনটিকে তিনি কোথায় রাখবেন যার সাঁইত্রিশ বছরের রক্তাক্ত যৌবন। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ালে হিমালয় হাত বাড়ায় আর মাথা নিচু করলে সাগর কোল পেতে দেয়। এত পবিত্র এই দিনটি। কিন্তু দিনটি ছিল কালবৈশাখীর মতো, যা সমস্ত অনুভূতিকে তোলপাড় করে দেয়। বিপর্যস্ত হন রবীন্দ্রনাথ পথের মোড়ে। রবীন্দ্রনাথের

বিপর্যস্ত হওয়াটা এখানে প্রতীকী। অর্থাৎ বাংলাভাষার যে বিপর্যয়ের সময় এসেছিল তারই প্রতীক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আসে।

তাই কবি খুঁজে পাচ্ছেন না এমন স্থান যেখানে বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এগারোজন শহিদ হন। তবে মূল সুর একটাই— 'জলবৃত্তে ঘুরে ফিরে জননীর আর্তনাদ'। এই যে টাটকা এগারটা প্রাণ শহিদ হয়েছিল তাদের মায়েদের আর্তনাদ চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এঁরা শহিদ হয়ে যে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন তাদের সেই পুণ্যতিথির দিন কবি কোথায় রাখবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

তথ্যসূত্র

১. করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য— বরাক উপত্যকার কবি।
২. তপোধীর ভট্টাচার্য— কবি, প্রাবন্ধিক, আলোচক, শিক্ষাবিদ।
৩. অমিতাভ দেবচৌধুরী— অসমের অন্যতম প্রধান কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নসুমারি'।
৪. জীবনানন্দ— জীবনানন্দ দাশ, বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা'।
৫. সঞ্জয় চক্রবর্তী— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম প্রধান কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'উৎসবের টেবিল,' 'মায়া পাহাড়'।
৬. প্রবুদ্ধসুন্দর— প্রবুদ্ধসুন্দর কর, ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'রাত্রিমথ', 'নৈশ শিস', 'যক্ষের প্রতিভূমিকা'।
৭. স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য— বরাক উপত্যকার কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্য সংকলন 'অ-কবিতা'।
৮. ভক্ত সিংহ— বরাক উপত্যকার কবি। মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি হলেও লেখেন বাংলা ভাষায়।
৯. কিশোর ভট্টাচার্য— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি। মূলত অসমিয়া ভাষায় লেখালিখি করেন।
১০. অতন্দ্র— বরাক উপত্যকার লিটল ম্যাগাজিন। অধুনালুপ্ত। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকায় কাব্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল।
১১. গোপীনাথ বরদলৈ— রাজনীতিক, অসমের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, তখন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) বলা হত।
১২. বিষ্ণুরাম মেধি— অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।
১৩. ডাঃ হৃদয়ানাথ কুঞ্জরু— সমাজতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ।
১৪. মনীশ ঘটক — সাহিত্যিক, 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে বিখ্যাত।
১৫. বনফুল— সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।
১৬. দক্ষিণারঞ্জন বসু— সাহিত্যিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ছেড়ে আসা গ্রাম'।
১৭. মনোজ বসু — সাহিত্যিক, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'নিশিকুটুম্ব'।
১৮. বিপ্ররাজ দাস— প্রাবন্ধিক। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
১৯. সুবীর কর— প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
২০. সনৎকুমার কৈরী— প্রাবন্ধিক। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
২১. পরিতোষ পাল চৌধুরী— ভাষাসংগ্রামী। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
২২. কানু আইচ — প্রাবন্ধিক। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
২৩. ইমাদ উদ্দিন বুলবুল — গল্পকার, ঔপন্যাসিক। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের

গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।

২৪. দিলীপকান্তি লস্কর — কবি, লালনমঞ্চ পত্রিকার সম্পাদক।

২৫. লালন মঞ্চ — দিলীপকান্তি লস্কর সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন।

২৬. কুমুদরঞ্জন মল্লিক — বাংলাভাষার অন্যতম জনপ্রিয় কপি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'শতদল', 'একতারা'।

২৭. কমলা ভট্টাচার্য — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের মধ্যে একমাত্র মহিলা।

২৮. নেহরু — জওহরলাল নেহরু, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

২৯. ফারুক আবদুল্লা— রাজনীতিক, জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

৩০. চলিহা — বিমলাপ্রসাদ চলিহা। রাজনীতিক, অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

৩১. দেবেন্দ্র কুমার পালচৌধুরী—বরাক উপত্যকার কবি।

৩২. শচীন্দ্র পাল — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের অন্যতম।

৩৩. চণ্ডীচরণ সূত্রধর — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের অন্যতম।

৩৪. কুমদরঞ্জন দাস — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের অন্যতম।

৩৫. কানাইলাল নিয়োগী — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের অন্যতম।

৩৬. সুকোমল পুরকায়স্থ — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের অন্যতম।

৩৭. সুনীল সরকার — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের অন্যতম।

৩৮. হিতেশ বিশ্বাস — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের অন্যতম।

৩৯. তরণী দেবনাথ — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের অন্যতম।

৪০. গীরেন্দ্র সূত্রধর — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের অন্যতম।

৪১. সত্যেন্দ্র দেব — ভাষাশহিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদের অন্যতম।

৪২. রামেন্দ্রসুন্দর দেশমুখ্য— বরাক উপত্যকার অন্যতম কবি।